বাংলাদেশের জনগণের নিকট

১৫ আগস্ট কি শোক দিবস ?

শেখ মুজিব কি জাতির পিতা ?

?

অধ্যাপক গোলাম আযম

বাংলাদেশের জনগণের নিকট ১৫ আগস্ট কি শোক দিবস? শেখ মুজিব কি জাতির পিতা?

অধ্যাপক গোলাম আযম

প্রকাশনায়

আল আযামী পাবলিকেশন্স

১১৯/২ কাজী অফিস লেন, বড় মগবাজার,

ঢাকা-১২১৭, ফোন-৯৩৫৩১১৩

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৮

বাংলাদেশের জনগণের নিকট ১৫ আগস্ট কি শোক দিবস? শেখ মুজিব কি জাতির পিতা? ◆ অধ্যাপক গোলাম আযম ◆ প্রকাশনায় : আল আযামী পাবলিকেশন্স, ১১৯/২, কাজী অফিস লেন, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৯৩৫৩১১৩ ◆ বর্ণবিন্যাস : গোলাম সাকলায়েন ◆ মুদ্রণে : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

নির্ধারিত মূল্য ঃ সাত টাকা মাত্র

www.pathagar.com

গণতন্ত্রই বাংলাদেশের ভিত্তি

১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তাঁর দলকে একমাত্র বিজয়ী দলের গৌরব দান করে। নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেন যে, শেখ মুজিবই প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। মি. ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে ইয়াহিয়া খান ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র না করলে পাকিস্তান থেকে এ দেশকে আলাদা করার প্রয়োজন হতো না।

জনগণের সিদ্ধান্তকে বানচাল করার ষড়যন্ত্র করার ফলেই জনগণকে বাধ্য হয়ে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

১৯৭০-এর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিগণই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করে এ নতুন রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন দিক দিয়ে যত ত্রুটিই থাকুক, সরকার-কাঠামো পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিকই ছিল। জাতীয় সংসদে শাসনতন্ত্র সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ার পর শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এভাবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার একটি বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক সরকার বলেই গণ্য হতে পারে।

বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যা

বাংলাদেশে প্রথম গণতন্ত্র হত্যাকারী কোনো সামরিক ব্যক্তি নয়। কলংকের কথা হলো, এমন এক ব্যক্তি এ কর্মটি সম্পন্ন করেন, যিনি ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে সারা জীবন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেছেন, যিনি জননেতা হিসেবে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আনুগত্য ও হেফাযতের শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তার মতো জনপ্রিয়তার কিংবদন্তি পুরুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের মাত্র দু'বছর পরই যে শাসনতন্ত্রের হেফাযতের শপথ নিলেন সে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকেই বিকৃত করে একদলীয় বাকশালী শাসন চালু করেন। তিনি কেন তার ভক্ত জনগণের উপর এত অল্প সময়ের মধ্যে আস্থা হারালেন তা সত্যিই বিস্ময়কর! তাহলে কি বাস্তবে তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল? তিনি আক্ষেপ করে তাঁর তৈরি দলীয় বাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেলাম চোরের খনি।'

www.pathagar.com

তিনি নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য সংগঠক ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ নেতৃত্বে যে বিশাল ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলেন তা যদি চোরের খনিতে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে এর জন্য তিনি ছাড়া আর কেউ তো দায়ী হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক পন্থা রুদ্ধ হয়ে গেল

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত করাই গণতন্ত্রের প্রধান দাবি। বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাই বিশ্বে গণতান্ত্রিক রাজনীতি হিসেবে গণ্য। নির্বাচিত দলীয় সরকার তার মেয়াদকালে জনগণকে সন্তুষ্ট করতে অক্ষম হলে পরবর্তী নির্বাচনে জনগণ অন্য দলকে নির্বাচিত করে। এটাই প্রচলিত গণতান্ত্রিক নীতি।

একদলীয় বাকশালী ব্যবস্থায় নির্বাচন হলে জনগণ বাধ্য হয়ে বাকশালকেই ভোট দেবে। এটাকে নির্বাচন বলা হাস্যকর। বাকশাল যাদেরকে মনোনয়ন দেবে তারাই নির্বাচিত হবে। তাহলে ভোটের কোনো দরকারই নেই। নির্বাচনী প্রহসন করেই মেয়াদ শেষে আবার বাকশালী শাসনই চালু হবে।

বাকশালী ব্যবস্থায় ৪টি দৈনিক পত্রিকা সরকারি মালিকানায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আর সব পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারি পত্রিকায় সবসময় সরকারের সব কাজের প্রশংসাই করা হবে। সরকারের সমালোচনা করার জন্য কোনো পত্রিকা না থাকলে জনগণ সরকারি স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবে না।

এ জাতীয় ব্যবস্থায় গোটা দেশ কারাগারে পরিণত হবে। জনগণ সরকারের গোলাম হয়ে নীরবে সবকিছু সহ্য করতে বাধ্য হবে। এ থেকে নিস্তার পাওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক পথই থাকবে না।

জাতীয় সংসদে এমন স্বৈরশাসন কেমন করে অনুমোদন পেল?

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শাসনতন্ত্রের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বাকশালী স্বৈরশাসনের পক্ষে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য কেমন করে সম্মতি দিলেন তা বিশ্বের মহাবিস্ময়! সংগ্রামী আওয়ামী লীগের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দসহ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কেমন করে এমন চরম গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন?

জানা যায় যে, ৩০০ এমপির মধ্যে মাত্র দু'জন গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে সংসদ সদস্য পদ পরিত্যাগ করেন। তাঁরা হলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম. এ. জি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। তাঁরাও অবশ্য আওয়ামী লীগেরই দলীয় এমপি ছিলেন। তবে এ দু'জনই মাত্র গণতন্ত্রে আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন।

বর্তমানে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ড. কামাল হোসেন এবং ১৯৭৫ সালে কারাগারে নিহত চার জাতীয় নেতাসহ আওয়ামী লীগের সকল এমপি অন্ধভাবে গণতন্ত্র হত্যায় নেতার আনুগত্য করলেন।

উক্ত সংসদের নির্বাচন ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৭টি আসন দয়া করে দখল করেনি। সে নির্বাচন কতটুকু 'নিরপেক্ষ' ছিল তা কারো অজানা নেই।

আওয়ামী লীগ যদি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতো তাহলে এভাবে সংসদের আসনগুলো দখল করতে চাইতো না এবং বাকশালী একদলীয় স্বৈরশাসন অনুমোদন করতে সম্মত হতো না। গণতন্ত্রের স্লোগান তাদের রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। ক্ষমতাসীন অবস্থায় কোনো কালেই এ দলটি গণতান্ত্রিক আচরণ প্রদর্শন করতে পারেনি।

স্বৈরশাসনের অনিবার্য পরিণাম

একটি গণতান্ত্রিক দেশে যদি এমন স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যে শাসন থেকে রেহাই পাওয়ার কোনো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে না, তাহলে এর ঐতিহাসিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে পড়ে। তখন শক্তি প্রয়োগ করে স্বৈরশাসনের অবসান করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকে না।

বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার বহাল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোনো উপায় রইল না। জনগণের পক্ষে শক্তি প্রয়োগের কোনো সুযোগ ছিল না। সরকারবিরোধী আন্দোলন করে গণঅভ্যুত্থানের উপায়ও ছিল না। অসহায় ও নিরুপায় জনগণকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সামরিক বিপ্লব ছাড়া আর কোনো পথই খোলা ছিল না। এ পথেই শেখ মুজিবের পতন ঘটে।

এমন পরিস্থিতিতে দেশে দেশে সশস্ত্র বাহিনীই সাধারণত এ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন মি. ভুট্টোর স্বৈরশাসন থেকে ১৯৭৭ সালে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু সামরিক শাসক নিজেই আবার স্বৈরশাসকে পরিণত হন।

বাংলাদেশে ১৯৭৫ সালে যিনি সেনাপ্রধান ছিলেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা নীরবে বাকশালী স্বৈরশাসনকে মেনে নেন। কিন্তু ট্যাংক বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কয়েকজন সেনাকর্মকর্তা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। স্বৈরশাসন থেকে জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য শেখ মুজিবকে হত্যা করা অপরিহার্য মনে করেন।

এটা অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, গোটা সশস্ত্র বাহিনী ও 'রক্ষী বাহিনী' নামক শেখ মুজিবের গদিরক্ষাকারী সশস্ত্র বাহিনী থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন জুনিয়র সেনাকর্মকর্তা এত বড় দুঃসাহস কেমন করে করলেন? যদি তারা এ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হতেন তাহলে তাদের সবাইকে কোর্ট মার্শালে জীবন দিতে হতো।

www.pathagar.com

মুজিব সরকারের সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা বিভাগ, শেখ মুজিবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এবং মুজিব সরকারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাশিয়ার গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান কেজিবি সদা তৎপর থাকা সত্ত্বেও মুজিব হত্যার মতো এতো বড় বিরাট ঘটনা সত্যিই অলৌকিক ব্যাপার!

মুজিব হত্যাকারীদের অদ্ভুত আন্তরিকতা

মুজিব হত্যার পরিকল্পনাকারী সেনা কর্মকর্তারা লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফীর মতো সামরিক শাসন কায়েম করেননি। তারা শাসনতন্ত্রকে মুলতবি করেননি এবং জাতীয় সংসদকে বাতিল ঘোষণা করেননি। শেখ মুজিব সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী খোন্দকার মুশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত করান। তিন সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানগণ নতুন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় জুনিয়র অফিসারদের সশস্ত্র বিপ্লব সফল হয়। দেশ ও জনগণ স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পায় এবং গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হয়।

বিপ্লবী জুনিয়র অফিসারগণ যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে এ দুঃসাহস করতেন, তাহলে তারা সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখল করতেন, শাসনতন্ত্র বাতিল বা মুলতবি করতেন, জাতীয় সংসদ ভেঙে দিতেন এবং সশস্ত্রবাহিনীপ্রধানদেরকে অপসারণ করতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, দেশ ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তাঁরা জীবনের এত বড় ঝুঁকি নিয়ে এ অসাধ্য কাজ সমাধা করার হিম্মত দেখিয়েছেন।

মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া

১৯৭১ ও '৭২ সালে শেখ মুজিবের যে আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা ছিল এবং তিনি জনগণের যে আবেগপূর্ণ ভালোবাসার অধিকারী ছিলেন, যদি এর সামান্য পরিমাণও অবশিষ্ট থাকত তাহলে সপরিবারে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিছুটা হলেও প্রকাশ পেতো। জনগণের সামান্য সাড়া পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও বাকশাল নেতৃবৃন্দ অন্তত প্রতিবাদ মিছিল বের করতেন। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি।

জনগণ যদি সত্যিই শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করত তাহলে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত।

শেখ মুজিবের গদিরক্ষা বাহিনী (রক্ষী বাহিনী) যদি জনগণের সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করত তাহলে অবশ্যই হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করত। হত্যাকারী ট্যাংক বাহিনীর চেয়ে অনেক বিরাট রক্ষী বাহিনী বঙ্গভবন দখল করতে চেষ্টা করত এবং হত্যাকারীদেরকে সেখান থেকে অপসারণ করত। তারা অন্তত রেডিও স্টেশন দখল করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারত।

রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠে মুজিব হত্যার সংবাদ জেনে সারাদেশে জনগণের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, এর জলন্ত সাক্ষী ১৫ আগস্ট থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাসমূহ। দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ সে সময় প্রধান পত্রিকা ছিল। ঐ পত্রিকা দুটোতে ১৫ আগস্ট থেকে ক্রমাগত যত সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের বয়স ৪৫-এর ঊর্ধ্বে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতাদের নিকট যদি দাবি জানানো হয় যে, আপনাদের পরিচালনায়ই জরিপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করুন যে, মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়ায় জনগণ শোক প্রকাশ করেছিল কি না, তাহলে কি তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন?

আমি তখন লন্ডনে ছিলাম। আমি ইস্ট লন্ডন এলাকায় অবস্থান করতাম যেখানে বাংলাদেশী প্রবাসীরা সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বসবাস করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা দেশের জনগণের চেয়েও বেশি উৎসাহের সাথে সক্রিয় ছিলেন। দেশে তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কারণে প্রকাশ্যে তৎপরতা চালানো সহজ ছিল না। লন্ডনে তো পরিবেশ ভিন্ন ছিল। মুজিব হত্যার পর দেশে তো কেউ সামান্য প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। কিন্তু লন্ডনের পরিবেশে আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও কেন সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে পারলেন না তা সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার! কেউ ব্যক্তিগতভাবেও শোক প্রকাশ করেছে বলে জানা যায়নি।

লন্ডনের পত্রিকায় ১৫ আগস্টের খবর যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এর বিশুদ্ধ অনুবাদ থেকে জনগণের মধ্যে মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া জানা যায়। নিম্নে অনুবাদ পেশ করা হলো :

'১৫ আগস্ট। ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। শুক্রবারের নামাযের সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যে দু'ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেয়া হয়। ঐ সময় সংগঠিত মিছিলের আকারে জনগণকে মসজিদের দিকে যেতে দেখা যায়। তাদের চোখ-মুখ, হাবভাব ও আচরণ দেখে মনে হয় যে, তারা কোনো জাতীয় উৎসব পালন করছে। রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কে একই দৃশ্য দেখা গেল।'

লন্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত এ রিপোর্ট সঠিক কি না এর সাক্ষ্য তারাই দিতে পারেন যারা তখন ঢাকায় ছিলেন। আওয়ামী লীগের ৪৫ ঊর্ধ্ব বয়সের সকলেই এর সাক্ষী। তাদের সাহস থাকলে কেউ বলুন যে, এ রিপোর্ট সঠিক নয়।

১৫ আগস্ট কি শোক দিবস?

বাংলাদেশের বর্তমান সেনাপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারের উপদেষ্টাগণের মধ্যে একজনও কি লন্ডনের পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট মিথ্যা বলে দাবি করতে

www.pathagar.com

পারবেন? তারা তো জাতীয় শোক দিবস পালন করলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যদি গোটা জাতি উল্লাস করে থাকে এবং ঐ দিনটিকে নাজাত দিবস মনে করে থাকে তাহলে ঐ দিনটিকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করা দ্বারা কি জাতিকে অপমানিত করা হলো না? জাতি উল্লাস করল, আর তারা শোক প্রকাশ করে জাতির সাথে প্রতারণা ও বিদ্রূপ করলেন!

মুজিব হত্যাকারীরা যদি ফাঁসির যোগ্য অপরাধ করে থাকেন তাহলে গোটা জাতিকেই উল্লাস করার দোষে অপরাধী সাব্যস্ত করতে হয়। ১৯৭৫ সালে যদি জাতি শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতো তাহলে জিয়াউর রহমানের জানাযার সময় সশস্ত্রবাহিনীর লোক ও জনগণ যেরকম শোক প্রকাশ করেছে এর চেয়ে অনেক বেশি মুজিব হত্যার কারণে শোকাভিভূত হতো।

সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফ এ বছর (২০০৮) ১৫ আগস্টে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশে দাবি করেন যে, মুজিব হত্যার জন্য যদি ফাঁসি দিতে হয় তাহলে তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহকেই প্রথমে ফাঁসি দেয়া উচিত। পত্রিকায় এটুকুই পড়েছি। কোন্ যুক্তিতে তিনি এ দাবি করলেন তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

আমার ধারণা, এ দাবির পেছনে যুক্তি হলো যে, সেনাপ্রধান হিসেবে দেশের প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালনে সেনাপ্রধান ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরই অধীনস্থ কতক সেনা কর্মকর্তা কেমন করে এ হত্যাকাণ্ড চালানোর পরিকল্পনা করল যে, তা তিনি টেরই পেলেন না। এরপর আরো বড় অপরাধ হলো যে, সেনাপ্রধান হয়ে হত্যাকারীদের অপরাধকে অনুমোদন দিয়ে তাদের মনোনীত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেন।

আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দ মুজিব হত্যার সময়ও দলীয় নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৯৬ সালে তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুজিব হত্যার পর ৩০ বছর পর্যন্ত হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানালেন না কেন? তারা ১৯৭৯ সালে নির্বাচিত ২য় জাতীয় সংসদ, ১৯৮৬ সালে নির্বাচিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ এবং ১৯৯১ সালে নির্বাচিত ৫ম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। এ দীর্ঘ সময়ে কি তারা ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করার দাবিতে সোচ্চার ছিলেন? ১৯৯৬-এর নির্বাচনী প্রচারাভিযানেও তারা এ দাবিকে ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেননি। তাহলে তারা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হঠাৎ এ বিষয়ে কেন এত সিরিয়াস হলেন? ৩০ বছরে নতুন প্রজন্ম যুবকে পরিণত হওয়ার পর তারা এ ইস্যুটি আবিষ্কার করেন। ক্ষমতায় থাকার সুযোগ পেয়ে এ নিয়ে সোচ্চার হওয়ার সাহস পেলেন।

www.pathagar.com

কারাগারে চার নেতার হত্যা

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ ক্ষমতা দখলের দিবাগত রাতে কারা ঢাকা কেন্দ্রীয় করাগারে ঢুকে আওয়ামী লীগের শীর্ষ চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করল সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়নি। এত বছর পর মামলার রায়ে আদালতে ১৩ জনকে ফাঁসিসহ বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু ২৮.০৮.২০০৮ তারিখে হাইকোর্ট একজন ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামির সাজা বহাল রেখে সকল আসামিকে খালাস দেয়। এতে ঐ আজব হত্যাকাণ্ডের রহস্য আরো ঘনীভূত হয়।

এত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের কারাগারে আটক থাকা অবস্থায় কারা কর্তৃপক্ষকে কাবু করে যারা এ হত্যাকাণ্ড ঘটাল তাদেরকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হওয়া অস্বাভাবিক। বাইরে থেকে কারাগারের লৌহকপাট না ভেঙে যারা ভেতরে ঢুকতে পারল তারা নিশ্চয়ই এমন সরকারি ক্ষমতাশীল হয়ে থাকবে, যাদের নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য কারা কর্তৃপক্ষের ছিল না। যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে কারা কর্তৃপক্ষ থেকে তাদের পরিচয় সংগ্রহ করা অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। আর যদি তারা এমন উন্নত মারণাস্ত্রের অধিকারী হওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে তারা যদি সামরিক পোশাক পরিহিত হয়ে থাকে তাহলে তো তাদের ছবি নিয়ে রাখতে পারত।

যা-ই হোক, কারাগারে নেতাদের এ হত্যাকাণ্ড দেশের জন্য সত্যিই কলঙ্কজনক। এর সুবিচার দাবি করা অত্যন্ত সঙ্গত এবং ঘাতকদেরকে চিহ্নিত করতে অক্ষমতা সরকারের চরম ব্যর্থতার পরিচায়ক।

চার নেতা কারাগারে অসহায় অবস্থায় বন্দী। তাদের কোনো অপরাধ থাকলে আদালতে বিচার করা যেত। তাদেরকে বিনা বিচারে এভাবে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ।

মুজিব হত্যা কি জেল হত্যার মতোই অপরাধ?

মুজিব হত্যার আসামিদের শাস্তি কার্যকর করার জন্য আওয়ামী লীগ অব্যাহতভাবে এ সরকারের নিকট সোচ্চার দাবি জানাচ্ছে। যে বিচারপতিগণ এ মামলার বিচারের দায়িত্ব পালনে বিব্রতবোধ করছেন তাদের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করতেও তারা কার্পণ্য করছেন না।

তারাই আবার বিভিন্ন সময় বলেন যে, জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠানই এ সরকারের প্রধান দায়িত্ব, অথচ মুজিব হত্যার আসামিদের ফাঁসি কার্যকর করার জন্য বার বার চাপ প্রয়োগ করে চলেছেন। তারা তো বর্তমান সরকারের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় যাবার জন্য অধীর অপেক্ষায় আছেন। আঁতাত অনুযায়ী আংশিক স্থানীয় নির্বাচনে ‘টেস্ট কেস’ হিসেবে অংশগ্রহণ করে বিরাট সাফল্য

অর্জনের কারণে জাতীয় সংসদের বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েই আছেন। আর কয়টা মাস ধৈর্য ধরে থাকলে তো ক্ষমতায় গিয়ে তাদের এ দাবি নিজেরাই পূরণ করতে পারবেন।

যা হোক, আমি প্রশ্ন তুলেছি যে, মুজিব হত্যা কি জেল হত্যার মতোই জঘন্য অপরাধ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব উপলব্ধি করতে হলে জানতে হবে যে, শেখ মুজিব শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে স্বৈরশাসন চালু করার ব্যবস্থা করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হলে দেশের হাল কী দাঁড়াত? যদি মুজিব হত্যা না হতো তাহলে জনগণের দশা কী হতো?

বাকশালী শাসন ব্যবস্থা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে বাকশালী শাসন ব্যবস্থা সরকারিভাবে চালু করার ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানই সে ঘোষণা দিতেন।

ঐ শাসন ব্যবস্থার কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

১. শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'- স্লোগান চালু হয়।
২. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (BAKSAL) একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসেবে শাসন ক্ষমতায় থাকবে।
৩. শেখ মুজিব বাকশালের আজীবন সভাপতি থাকবেন।
৪. বাংলাদেশকে ৬১টি প্রদেশে ভাগ করা হবে। প্রতিটি প্রদেশের শাসক হিসেবে একজন করে গভর্নর থাকবেন।
৫. প্রদেশের প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী গভর্নরের কর্তৃত্বাধীন থাকবে। গভর্নর বাকশালের প্রাদেশিক সভাপতির দায়িত্বও পালন করবেন।
৬. গভর্নরগণ একমাত্র রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকবেন। তাদেরকে আর কোথাও জবাবদিহি করতে হবে না।
৭. হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতেই থাকবে।

এ শাসন ব্যবস্থার ঘোষণা ১৫ আগস্ট (১৯৭৫) হয়ে যাওয়ার পরই গভর্নরগণের দায়িত্ব গ্রহণ করার কথা ছিল। ৬১ জন আওয়ামী লীগ নেতাই গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। পত্রিকায় তাদের তালিকা প্রকাশিতও হয়েছিল।

বাকশালী শাসন ব্যবস্থা চালু হলে

যদি এ ব্যবস্থা চালু হয়ে যেতো তাহলে শেখ মুজিব বিশ্বের সেরা ক্ষমতাশালী একনায়কের সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতেন। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট তাকে জবাবদিহি করার প্রয়োজন হতো না। জাতীয় সংসদের

সদস্যগণ তারই মনোনীত ব্যক্তি হতেন। বাকশাল সভাপতি হিসেবে তিনি দলের সকল প্রার্থীকে নমিনেশন দিতেন। আর কোনো রাজনৈতিক দল না থাকায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনো দরকার থাকত না। জনগণ একমাত্র বাকশাল প্রার্থীদেরকেই ভোট দিতে বাধ্য হতো।

এ শাসন ব্যবস্থায় গোটা বাংলাদেশই এক বিশাল কারাগারে পরিণত হতো। জনগণ গভর্নরদের গোলামে পরিণত হতো। প্রতিটি প্রদেশেই গভর্নর রাজার পজিশন ভোগ করতেন। আর শেখ মুজিব মহারাজার গৌরব অর্জন করতেন। ১৯৭২ থেকে '৭৫ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও রক্ষী বাহিনীর যে দাপট ছিল, এর চেয়ে অনেক বেশি হিংস্রতা নিয়ে বাকশালীরা শাসন ও শোষণ চালাতে সক্ষম হতো। জেলের কয়েদিরা যেমন জেলপুলিশের মর্জিমতো চলতে বাধ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণ তেমনি বাকশালী প্রশাসন ও পুলিশের গোলামে পরিণত হতো।

সরকারি পত্রিকা ছাড়া কোনো পত্রিকা না থাকায় সরকারি দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো খবরই প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ থাকত না। গভর্নর পর্যন্ত কোনো রকমে অভিযোগ পৌঁছাতে পারলে একমাত্র তার দয়ায় প্রশাসন, পুলিশ ও বাকশালী জুলুম থেকে হয়তো কেউ রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারত।

ঐ সময় জোসেফ স্ট্যালিনের সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া এ জাতীয় স্বৈরশাসন দুনিয়ার কোথাও চালু ছিল বলে জানা নেই।

১৫ আগস্ট মুক্তি দিবস

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাকশালী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে দেশ ও জনগণের যে দশা হতো তা থেকে হয়তো আজো মুক্তি পাওয়া সহজে সম্ভব হতো না। ঐ শাসনের যাঁতাকল থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। জনগণ চরম আতংকের মধ্যে ছিল। তাই বাকশাল চালু হওয়ার আগের রাতে শেখ মুজিবকে হত্যা করার খবর জানার সাথে সাথে গোটা দেশবাসী এত বেশি উল্লসিত হয়ে পড়ে।

নারী ও শিশুসহ কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এভাবে সপরিবারে নিহত হওয়ার ঘটনা গৌরবজনক হতে পারে না। কিন্তু যখন কোনো স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব সংঘটিত হয় তখন এ জাতীয় নির্মম ঘটনা ইতিহাসে বিরল নয়। বিপ্লবীরা সফল হওয়ার উদ্দেশ্যে যাদেরকে হত্যা করা প্রয়োজন বোধ করে তাদের হত্যা করা কর্তব্যও মনে করে।

সফল বিপ্লব

বিপ্লব তখনই সফল হয়, যখন জনগণের ব্যাপক সমর্থন বিপ্লবীদের পক্ষে আছে বলে বোঝা যায়। সফল বিপ্লব তাকেই বলে, যখন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া

www.pathagar.com

দেখা যায় না। বিপ্লব বিফল হলে তো বিপ্লবীদেরকে মৃত্যুদণ্ডই ভোগ করতে হয়। আর বিপ্লব সফল হলে বিপ্লবী সরকারকে সব রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয়।
বাকশালী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ ও জনগণের যে সর্বনাশ হতো তা থেকে নিস্তার পেয়ে জনগণ যে মুক্তির স্বাদ উপভোগ করেছে তা তো ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবের পর নতুন সরকারকে যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র বিপ্লবের পূর্বে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি, সেই চীন ও সৌদি আরবও বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।
বিশ্বের ইতিহাসে কোনো নজির নেই যে, বিপ্লব সফল হওয়ার পর বিপ্লবীদেরকে পরে কোনো সরকার অপরাধী হিসেবে গণ্য করে।

আগস্ট বিপ্লবের সুফল

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তার ফলে

১. দেশে এক চরম স্থায়ী একনায়কত্ব থেকে মুক্তি পায়।
২. জনগণ একদলীয় স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি লাভ করে।
৩. আওয়ামী লীগসহ সকল রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবনের সুযোগ ঘটে।
৪. গণতন্ত্রের পুনর্জন্মের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।
৫. সংবাদপত্র স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করে এবং জনগণ প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

আগস্ট বিপ্লবের ৩৩ বছর পর আজো (২০০৮) জনগণ উপরিউক্ত সুফল ভোগ করছে।
এটা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর ঘটনা যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আজীবন সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং গণতন্ত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করলেন। আর সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনর্বহাল করলেন। আগস্ট বিপ্লব না ঘটলে আজো এ দেশে গণতন্ত্র বহাল করা সম্ভব হতো কি না কে জানে!

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বে মুজিব হত্যার বিচার দাবি কেন করেননি?

১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে নিরংকুশ না হলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেত্রী হন এবং জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হন।
মুজিব হত্যার বিশ বছর পর উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শেখ হাসিনা নির্বাচনী প্রচারাভিযানের পূর্বে ওমরাহ করতে যান এবং ইহরামের পোশাক

www.pathagar.com

পরিহিত অবস্থায়ই হাতে তাসবীহ নিয়ে ঢাকায় বিমান থেকে অবতরণ করেন। এ পোশাক পরে এবং হাতে তাসবীহ নিয়েই তিনি গোটা নির্বাচনী অভিযান চালান।

প্রচারাভিযানকালে তিনি তাসবীহ হাতে নিয়ে দু'হাত জোড় করে জনগণের নিকট কাতরভাবে আবদার জানান যে, একটি বারের জন্য পরীক্ষামূলকভাবেই এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ দান করুন। তার দলের পূর্বে কৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার জন্যও বিনীতভাবে আবেদন জানান।

তার সমগ্র প্রচারাভিযানে একটিবারও তিনি তার পিতার হত্যার বিচার করার সুযোগ দেয়ার জন্য ভোট প্রার্থনা করেননি। ঐ সময়কার পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনি সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন বলেও কোনো সংবাদ পাওয়া যাবে না। কিন্তু ২৩ জুন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা লাভের কিছুদিন পরই তার পিতার হত্যার বিচারের জন্য আবেগ প্রকাশ করতে শুরু করেন। নিহত পিতামাতা ও ভাইদের জন্য আবেগ প্রকাশ তো অত্যন্ত স্বাভাবিকই।

তার পিতার হত্যার সময় থেকে প্রায় ৬ বছর তিনি দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির আশ্রয়ে ছিলেন। ঐ ৬ বছরের মধ্যে তার দলের নেতারা (আজ যারা মুজিব হত্যাকারীদের ফাঁসি কার্যকর করার ব্যাপারে সাংঘাতিক সোচ্চার) কি ঐ নির্মম হত্যার সামান্য প্রতিবাদও করতে পারতেন না? হত্যার বিচার দাবি করার সাহস না থাকলেও সামান্য বিলাপও কি করা সম্ভব ছিল না?

জনগণের মধ্যে মুজিব হত্যার পক্ষে যে সুস্পষ্ট ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ লক্ষ্য করেছেন, তাতে এ হত্যার সামান্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করাও যে সম্ভব ছিল না তা সহজেই বোধগম্য।

ঘটনার ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ নেতারা ক্ষমতা লাভ করার পরই এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সম্ভব বলে উপলব্ধি করলেন। ইতোমধ্যে জনগণের মধ্যে নতুন প্রজন্মের যুবক ও কিশোরদের সংখ্যা বিরাট হয়ে গেল, যারা শেখ মুজিবের কু-শাসন ও বাকশালী কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে কিছুই জানে না।

মুজিব হত্যার বিচার ব্যবস্থা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পিতার হত্যাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবেই গণ্য করে এর বিচারের ব্যবস্থা করেন। যদি এটা বিপ্লবী হত্যা না হয়ে ফৌজদারি হত্যা হয়ে থাকে তাহলে প্রকাশ্য ফৌজদারি আদালতেই এ হত্যার শুনানি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এ হত্যাকে ফৌজদারি অপরাধ বলে দাবি করলেও তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এ মামলার বিরুদ্ধে জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের আশংকা রয়েছে। এমন নিরাপদ স্থানে বিশেষ আদালতে নিজের বাছাই করা বিচারকের নেতৃত্বে এ মামলার শুনানি গ্রহণের ব্যবস্থা না

www.pathagar.com

করে উপায় নেই। তাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুউচ্চ দেয়ালের অভ্যন্তরে বিশেষ আদালতেই তিনি শুনানির ব্যবস্থা করেন। উক্ত আদালত মামলার রায়ে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

হাইকোর্টে আপিল হলো

শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন থাকাকালেই সাজাপ্রাপ্ত আসামিগণ হাইকোর্টে আপিল করেন। বিশেষ আদালতে সাজাপ্রাপ্তদের আপিলের কারণে যে শুনানি হবে, তাতে বিচারপতির দায়িত্ব পালনে কয়েকজন বিচারপতি বিব্রতবোধ করেন।
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দায়ের করা মামলায় বিশেষ আদালত যে রায় দিয়েছেন, তা বহাল রাখার দায়িত্ব পালন তো দূরের কথা, মামলার শুনানি গ্রহণ করতেও বিব্রতবোধ করার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এর তীব্র প্রতিক্রিয়াস্বরূপ স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিমের নেতৃত্বে বিব্রতবোধকারী বিচারকদের বিরুদ্ধে লাঠি-মিছিল বের করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিছিলেই ঘোষণা করেন, 'সুবিচার আদায় করতে কোথায় লাঠি মারতে হয় তা আওয়ামী লীগ জানে।' যা হোক, শেষ পর্যন্ত বিশেষ আদালতের রায় সামান্য পরিবর্তন করে বহাল করা হয়।

সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে মামলার হাল

দেশের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের অনুমোদন অপরিহার্য। এ মামলার বিচারকার্য সমাধা হওয়ার পূর্বেই ২০০১ সালের জুন মাসে শেখ হাসিনার শাসনকালের মেয়াদ শেষ হয়।
চারদলীয় জোট সরকার ২০০১ সালের অক্টোবরে শুরু হয় এবং ২০০৬ সালের অক্টোবরে ঐ সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। জোট সরকারের আমলে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে এ মামলার শুনানি হয়নি।
এখনো মামলা আপিল বিভাগেই ঝুলে আছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় নির্বাচিত সরকারের প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়ে গেল। এ মামলার সমাপ্তি কত দিনে হবে তা অনিশ্চিত। আওয়ামী লীগ বর্তমান সরকারের নিকট অব্যাহতভাবে দাবি জানাচ্ছে যাতে এ সরকারের আমলেই মামলাটির চূড়ান্ত ফায়সালা হয়।
দেশবাসী অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সাথে এ মামলার চূড়ান্ত রায় জানার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। যারা আগস্ট বিপ্লবে উল্লসিত হয়েছিল তারা প্রাণভরে কাতরভাবে দু'আ করছে যেন স্বৈরশাসন থেকে মুক্তিদাতারা মুক্তি পান এবং পূর্ব মর্যাদায় জনগণের নিকট ফিরে আসেন!

www.pathagar.com

বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রধান রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব

বিএনপি ও আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল। তাদের মধ্যে অনেক ইস্যুতেই মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবে প্রধান দ্বন্দ্ব হলো জিয়াউর রহমান ও শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে :

১. বিএনপি শেখ মুজিবকে বাংলাদেশী জাতির জনক মনে করে না। আর আওয়ামী লীগ জোর দাবি করে যে, শেখ মুজিব অবশ্যই জাতির পিতা।

২. বিএনপি মনে করে যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ডাক দেননি। দিলে স্বেচ্ছায় পাকিস্তান সরকারের নিকট গ্রেফতার হতেন না। যুদ্ধ ঘোষণা করে কোনো সেনাপতি নিজের ইচ্ছায় শত্রুপক্ষের নিকট ধরা দেয় না।

   আওয়ামী লীগ দাবি করে যে, ২৫ মার্চ (১৯৭১) গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য এর কোনো সামান্য প্রমাণও তারা এ পর্যন্ত প্রদর্শন করতে পারেননি।

৩. বিএনপি দাবি করে যে, ২৫ মার্চে জিয়াউর রহমান পাক সেনাবহিনী থেকে বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাই তিনিই স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক। অবশ্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিব জনগণের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা পাওয়ার কারণে ২৬ মার্চ (১৯৭১) মেজর জিয়া শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে শেখ মুজিব স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন।

৪. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করা শুরু করে এবং এ দিবসটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করে।

   ২০০১ সালে চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৫ আগস্টের সরকারি ছুটি বাতিল করে এবং সরকারিভাবে জাতীয় শোক দিবস পালন করা থেকে বিরত থাকে।

৫. ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের ফলে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হন। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে এবং এ দিবসটিকে সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে এ দিবসটির ছুটি বাতিল করে এবং বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন থেকে বিরত থাকে।

www.pathagar.com

এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের বৃহৎ দুটো দল ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর ইস্যুতে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফল থেকে দেখা যায়, এ দুটো দল শতকরা ৮০ জন ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিটি দল শতকরা ৪০ জনের ভোট পেয়েছে। ভোটারদের অবশিষ্ট শতকরা ২০ ভাগ উপরিউক্ত ইস্যুতে বিএনপির পক্ষেই রয়েছে। তাহলে প্রমাণিত হলো যে, উক্ত ইস্যুতে ভোটারদের শতকরা ৬০ ভাগ একদিকে এবং মাত্র ৪০ ভাগ অপরদিকে।

সশস্ত্র বাহিনী ঐ দুটো ইস্যুতে কোন্ পক্ষ?

দেশবাসীর বিশ্বাস যে, সশস্ত্র বাহিনী কোনো রাজনৈতিক পক্ষের সমর্থক নয়। তারা রাজনীতিনিরপেক্ষ। তারা দেশবাসীর আস্থাভাজন। এ বিশ্বাসের কারণেই জনগণের মধ্যে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, ২০০৭ সালের ২৭ মার্চ বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে সেনাপ্রধান শেখ মুজিবকে জাতির জনক হিসেবে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি না দেয়ায় যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, তা কি তার ব্যক্তিগত মত? সেনাবাহিনী তো রাজনৈতিক কোনো পক্ষ নয়! তিনি অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পর এ মত প্রকাশ করলে কোনো প্রশ্নের সৃষ্টি হতো না। সেনাপ্রধানের পদে বহাল থাকা অবস্থায় তিনি কোন্ অধিকার বলে একটি রাজনৈতিক পক্ষ অবলম্বন করলেন?

ড. ফখরুদ্দীন সরকার এবার সরকারিভাবে ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালন করার ব্যবস্থা করেছেন এবং রাষ্ট্রপতিকেও শেখ মুজিবের মাযার যিয়ারতে নিয়ে গেলেন, এমনকি স্বয়ং সেনাপ্রধানও গেলেন। এতে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, সেনাপ্রধান কি সরকারের সমর্থক, না পরিচালক?

এ প্রশ্ন সৃষ্টির আরো একটি কারণ আছে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে শেখ মুজিবকে জাতির পিতা হিসেবে উল্লেখ করার কোনো সিদ্ধান্ত ফখরুদ্দীন সরকার নিয়েছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, অথচ বাস্তবে তা করা হয়েছে। দেশের জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ ভোটার এর সাথে একমত না হওয়া সত্ত্বেও তাদের সন্তানদেরকে এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য করার অধিকার কোথায় পাওয়া গেল?

এটা ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া আর কোন্ অভিধায় উল্লেখ করা যায়? ক্ষমতার অপব্যবহার দুর্নীতি বলে গণ্য কি না?

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তো পাঠ্যবইতে জাতির পিতা লিখিয়ে দিলেন! শেখ হাসিনাও ক্ষমতায় গিয়ে এ কর্মটি করেছিলেন। কিন্তু ২০০১ সালে গণতান্ত্রিক সরকার তা তুলে দেয়। আগামীতে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হলে তেমনিভাবে বর্তমান সরকারের জোর করে চাপিয়ে দেয়া বিষয়টি উৎখাত হয়ে যাবে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

"১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন।

দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।.......

মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চ মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত হলেন।"

এন্থনী মাসকারেন হাস, সানডে টাইমস,

লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫